The Dhaka University Journal of Linguistics : Vol. 13, No. 25-26, Published by the Registrar, University of Dhaka, ISSN 2075-3098

বাংলাদেশের নদীকেন্দ্রিক উপন্যাসে পূর্ববঙ্গীয় উপভাষা

হোসনে আরা*

Abstract : Bangladesh is a riverine country. River and riverine life occupy a significant space in the enormous canvas of Bangla literature. Some of the Bangla novels painted a graphic picture of rivers and river-side life as their central theme. In these novels, regional language or dialect has been used artistically for vivid expression of native country life. Each dialect has distinct features. Dialect also differs with occupation and class. The rationale for using such dialects lies in the attempt to make the novel realistic. There is no substitute for using dialects to make cantonal life authentic. Dialects are usually used in dialogues with formal language in these novels. In this article, an attempt has been made to trace the nature of the East Bengali dialect used based on two riverine novels.

চাবি শব্দ : নদী, উপন্যাস, উপভাষা, আঞ্চলিক ভাষা, রূপমূল, প্রবাদ-প্রবচন

নদীই বাংলাদেশের প্রাণ। নদী ও জীবনের অন্বয়ে এ ভূখণ্ডের মানুষের বাস আবহমানকালের। ব-দ্বীপীয় বাংলাদেশ ভূখণ্ডে জমিনে ও জলে জীবন-জীবিকার বিচিত্র বিকাশ কালের নানা আবর্তে বহুস্তরী রূপ লাভ করে বাংলাদেশের উপন্যাসে উপজীব্য হয়েছে। সাতচল্লিশোত্তর বাংলাদেশের উপন্যাসের ধারায় নদীকেন্দ্রিক জীবন নিয়ে যে সীমিত সংখ্যক উপন্যাস রচিত হয়েছে, তার মধ্যে অদ্বৈত মল্লবর্মণের *তিতাস একটি নদীর নাম* (১৯৫৬), আলাউদ্দীন আল আজাদের *কর্ণফুলী* (১৯৬২), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র *কাঁদো নদী কাঁদো* (১৯৬৫), আবু ইসহাকের *পদ্মার পলিদ্বীপ* (১৯৮৬) উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে *কাঁদো নদী কাঁদো* আঞ্চলিক জীবনভিত্তিক নয়, *কর্ণফুলী*তে লিপিবদ্ধ হয়েছে বাংলাদেশের দক্ষিণবঙ্গীয় জীবনধারা ও ভাষা ; সঙ্গতকারণেই এ নিবন্ধে উপজীব্য হয়েছে *তিতাস একটি নদীর নাম* ও *পদ্মার পলিদ্বীপ* উপন্যাসদ্বয় – যেখানে পূর্ববঙ্গীয় উপভাষা[১] ব্যবহৃত হয়েছে।

১.২

কোনো ভাষা সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছোটো ছোটো দলে বা অঞ্চলে বিশেষ প্রচলিত ভাষা ছাঁদকে উপভাষা বলে (সেন, ১৯৯৪ : পৃ. ১৮)। একই ভাষা ঐতিহাসিক কারণে স্থান-

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কাল-পাত্র-ভেদে একাধিক উপভাষায় যেমন রূপান্তরিত হয়, তেমনি কোন কোন উপভাষাও ঐতিহাসিক, রাষ্ট্রীয় বা সাংস্কৃতিক অথবা অপর বিশেষ কোন সুযোগ লাভ করে একটি কেন্দ্রীয় উপভাষার মর্যাদা লাভ করে। এই কেন্দ্রীয় উপভাষাই সমগ্র ভাষা পরিবারের আদর্শ কথ্য ভাষা বা চলিত ভাষা-রূপে গৃহীত হয় (ভট্টাচার্য, ১৯৯৬ : পৃ. ৪০২)।

অন্য মতে, উপভাষা হচ্ছে চলিত ভাষার একটা উপরূপ; যা চলিত ভাষার চেয়ে কম ভাষাভাষীদের অঞ্চলে নিজস্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবহৃত হয় (মোরশেদ, ১৯৯৭ : পৃ. ১৪২)। তবে নির্দিষ্ট অঞ্চলে ব্যবহৃত উপভাষা ও চলিত ভাষার পার্থক্য অত্যধিক বেড়ে গেলে তাকে উপভাষা না বলে স্বতন্ত্র ভাষা বলে বিবেচনা করতে হবে ('শ, ১৪০৩ : পৃ. ৬৪৬)।

সব মিলিয়ে বলা যায় – উপভাষা হলো একটি ভাষার অন্তর্গত এমন বিশেষ-বিশেষ রূপ যা এক-একটি বিশেষ অঞ্চলে প্রচলিত, যার সঙ্গে আদর্শ ভাষা (Standard language) বা সাহিত্যিক ভাষার (Literary language) ধ্বনিগত, রূপগত ও বিশিষ্ট বাগধারাগত পার্থক্য আছে; এই পার্থক্য এমন সুস্পষ্ট যে ঐসব বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের রূপগুলোকে স্বতন্ত্র বলে ধরা যাবে, অথচ পার্থক্যটা যেন এত বেশি না হয় যাতে আঞ্চলিক রূপগুলোই এক একটি সম্পূর্ণ পৃথক ভাষা হয়ে ওঠে (লেখা, ২০১৭ : পৃ. ১৫)।

১.৩

স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ার্সন তাঁর Linguistic Survey of India-র পঞ্চম খণ্ডে বাংলা উপভাষাসমূহের যে বিবরণ দিয়েছেন এবং উপভাষার শ্রেণিকরণে যে পদ্ধতি প্রস্তাব করেছেন, তা অনুসরণে বাংলাদেশের আঞ্চলিক বা উপভাষাকে নিম্নোক্ত শ্রেণিকরণ করা যায় –

ক. উত্তরবঙ্গীয় : দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া ও পাবনার প্রচলিত উপভাষা;

খ. রাজবংশীয় : রংপুরের উপভাষা;

গ. পূর্ববঙ্গীয় : (অ) ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা (কুমিল্লা), বরিশাল ও সিলেটের উপভাষা; (আ) ফরিদপুর, যশোর ও খুলনার উপভাষা;

ঘ. দক্ষিণাঞ্চলীয় : চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও চাকমা উপভাষা (মোরশেদ, ১৯৯৭ : পৃ. ১৩৮)।

এই শ্রেণিকরণ অনুসারে আলোচ্য নিবন্ধে উপজীব্য উপন্যাসদ্বয়ের ভাষা পূর্ববঙ্গীয় গোত্রভুক্ত। *তিতাস একটি নদীর নাম* উপন্যাসে তিতাসকেন্দ্রিক জনজীবন ও ভাষা অর্থাৎ কুমিল্লা বা ত্রিপুরার উপভাষা এবং *পদ্মার পলিদ্বীপ* উপন্যাসে বৃহত্তর ফরিদপুর অঞ্চলের উপভাষা রক্ষিত। তবে *তিতাস একটি নদীর নাম* উপন্যাসের উপভাষা

পূর্ববঙ্গীয় গোত্রের (অ) উপগোত্রভুক্ত এবং *পদ্মার পলিদ্বীপ* উপন্যাসে ব্যবহৃত ভাষা (আ) উপগোত্রের অর্থাৎ এ উপভাষাদ্বয় একই গোত্রভুক্ত হলেও ভিন্ন উপগোত্রের অন্তর্গত।

২.১

তিতাস একটি নদীর নাম (১৯৫৬) উপন্যাসে অদ্বৈত মল্লবর্মণ (১৯১৪–১৯৫১) গভীর মমতায় তিতাস-তীরবর্তী একটি ব্যষ্টি জীবনের সামগ্রিক পরিচয় বিস্তৃত করেছেন। গোকর্ণঘাট গ্রামের মালো সমাজ এ উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য হলেও নদী-তীরবর্তী অন্য জনপদের খণ্ডিত জীবনচিত্রও এতে পাওয়া যায়। ঔপন্যাসিক তিতাস পাড়ের জেলে জীবনের পাশাপাশি আরও প্রান্তিক বিজয় নদী, বৃহৎ মেঘনা নদীর তীরের জেলে জীবনেরও তুলনামূলক ছবি এঁকেছেন – দেখিয়েছেন জেলেজীবনের যে কাঠামো এ উপন্যাসে তিনি নিয়ে এসেছেন তা অপরিবর্তনীয় নয় বরং স্থানভেদে তার বিভিন্ন রূপ পাওয়া যায় নদীবহুল এ বাংলায়। জেলেজীবন প্রাধান্য পেলেও নদী-তীরবর্তী ভূমিহীন প্রান্তিক মানুষ, অবস্থাপন্ন মুসলমান চাষী, নৌকা তৈরির কারিগর, বেদে – বিভিন্ন পেশাজীবীদের অদ্বৈত মল্লবর্মণ পরম মমতায় কাহিনিতে অঙ্গীভূত করে নদীকেন্দ্রিক জীবনে সমগ্রতা এনেছেন।

স্বাতন্ত্র্য ও গৌরবের অনেকগুলো প্রান্ত তিতাস-তীরবর্তী জনজীবনে রক্ষিত। মালো জীবনের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ প্রতিটি উৎসবে পালিত লোকাচার, তাদের কৃষ্টি, স্বপ্ন এবং তাদের বিলয়কে ফ্রেমবন্দি করা হয়েছে এ উপন্যাসে। আর তা করতে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়েছে আঞ্চলিক ভাষা ও সংস্কৃতির। ঔপন্যাসিকের নিজ কথনে তা লিপিবদ্ধ রয়েছে এভাবে –

> মালোদের নিজস্ব একটি সংস্কৃতি ছিল। গানে গল্পে প্রবাদে এবং লোকসাহিত্যের অন্যান্য মালমসলায় সে সংস্কৃতি ছিল অপূর্ব। পূজায় পার্বণে, হাসি ঠাট্টায় এবং দৈনন্দিন জীবনের আত্মপ্রকাশের ভাষাতে তাদের সংস্কৃতি ছিল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। মালো ভিন্ন অপর কারো পক্ষে সে সংস্কৃতির ভিতরে প্রবেশ করার বা তার থেকে রস গ্রহণ করার পথ সুগম ছিল না। কারণ মালোদের সাহিত্য উপভোগ আর সকলের চাইতে স্বতন্ত্র। পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত তাদের গানগুলি ভাবে যেমন মধুর, সুরেও তেমনি অন্তরস্পর্শী । সে ভাবের, সে সুরের মর্ম গ্রহণ অপরের পক্ষে সুসাধ্য নয় (বর্মণ, ২০০০ : ৫৪৫)।

মালোদের জীবন ও সংস্কৃতির বাস্তব ও অনুপুঙ্খ বিবরণে অনিবার্যভাবেই অদ্বৈত আশ্রয় নিয়েছেন তিতাস-তীরবর্তী আঞ্চলিক বা উপভাষার। মালো-জীবনের কথাকার অদ্বৈত মল্লবর্মণের জন্ম ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তিতাস নদীর তীরস্থ গোকর্ণঘাট গ্রামে। লেখকের জন্মস্থল ও উপন্যাসের পটভূমি একই। ব্রাহ্মণবাড়িয়া বৃহত্তর কুমিল্লা জেলার অংশ এবং এ অঞ্চলের ভাষাবৈশিষ্ট্য কুমিল্লা বা ত্রিপুরা ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত। লেখক সচেতনভাবেই

এ উপন্যাসে আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন চরিত্র-মুখের সংলাপ নির্মাণে। উপন্যাসের বর্ণনায় তিনি ব্যবহার করেছেন সাধু ভাষারীতি। একই উপন্যাসে সাধু রীতি ও উপভাষার স্থানিকতাকে পাশাপাশি রাখার প্রবণতাকে সমালোচকের বিশ্লেষণে দেখা যায় এভাবে –

> এ উপন্যাসের ভাষাতেও আছে একই সঙ্গে স্থানিকতা ও প্রবহমানতার সুর।...সামাজিক গতিশীলতার অভাবই তিতাসকে করে রাখে আঞ্চলিক, আবার অন্তর্গত প্রবহমানতার সূত্র সেখানে সৃষ্টি করে ভূগোল-ছেঁড়া সর্বকালীক আবেদন। ঈর্ষণীয় নৈপুণ্যে অদ্বৈত মল্লবর্মণ এই দুই বিপ্রতীপ অথচ গভীরতর অর্থে সমার্থক চেতনাকে শব্দ ও রেখায় ধারণ করেছেন (ঘোষ, ২০০৮ : বাইশ)

নদীর চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য ও অন্ত্যজ জীবনকে ভাবগাম্ভীর্য দেয়ার উদ্দেশ্যে সাধু ভাষারীতির প্রয়োগ যেমন শিল্পসফল, তেমনি প্রাকৃতজনের প্রাত্যহিক জীবনায়নে অবলম্বন করেছেন আঞ্চলিক বা উপভাষা। যেমন –

> গ্রামের পাশে সূর্য ঢাকা পড়িলেও আকাশে একটু একটু বেলা আছে। নৌকা বাহিলে আরো একটা বাঁক ঘোরা যাইত কিন্তু সম্মুখে রাত কাটাইবার ভাল জায়গা তিলক স্মরণ করিতে না পারায় কিশোর বলিল, 'এই জাগাত্ই রাইত্ থাইক্যা যাইরে সুবলা' (বর্মণ, ২০০০ : ৪১৭)।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কিশোরের মুখের ভাষায় অপিনিহিতি ই এবং অ্যা ধ্বনির বিস্তার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। গ্রীয়ার্সন ত্রিপুরার উপভাষার অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এ দুটি প্রথমেই উল্লেখ করেছেন (মনিরুজ্জামান, ১৯৯৪ : ২৫২)।

প্রাকৃতজনের অবলম্বিত এ ভাষায় ঔপন্যাসিক প্রভূত প্রবাদ-প্রবচন, ছড়া, গান, শ্লোক এবং আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা লোকায়ত জীবনকে আরও বাস্তবগ্রাহী করে তুলেছে। লক্ষণীয় যে, এ উপন্যাসে প্রযুক্ত অধিকাংশ প্রবাদ-প্রবচনের ধারক গ্রামের নারী সমাজ। জীবনের রূঢ়তা, কঠোর সংগ্রাম, অপরিসীম দারিদ্র্য এবং প্রবাহিত নদীর দার্শনিকরূপ – সবমিলিয়ে নারীরা তাদের সঞ্চিত জ্ঞান এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মের কাছে হস্তান্তরিত করে এসব প্রবচন, বাগধারা, শ্লোক ও ছড়ার মধ্য দিয়ে। এ উপন্যাসে রক্ষিত কিছু প্রবাদ-প্রবচনের উদাহরণ –

১. জিভে কামড় শিরে হাত, কেমনে আইল জগন্নাথ (বর্মণ, ২০০০ : ৪৪৮);
২. আমার দিদি কাটুনি সুতা কাটতে পারে।
   এক নাল সুতায় হস্তী বান্ধা পড়ে (বর্মণ, ২০০০ : ৪৪৯);
৩. পরের পাগল হাততালি, আপনা পাগল বাইন্ধা রাখি (বর্মণ, ২০০০ : ৪৭৫);
৪. মা নাই যার, ছাড় কপাল তার (বর্মণ, ২০০০ : ৫১৬);
৫. তীর্থের মধ্যে কাশী ইষ্টির মধ্যে মাসী
   ধানের মধ্যে খামা কুটুমের মধ্যে মামা (বর্মণ, ২০০০ : ৫১৬);

প্রবাদ-প্রবচনের মতো বাগধারা বা যৌথ শব্দবন্ধেরও বিশেষ প্রয়োগ দেখা যায় এ উপন্যাসে। 'ডুমুরের ফুল', 'বাড়াভাতে ছাই', 'কাকের মুখে সিন্দুইরা আম', আঁটকুড়ার রাজা', 'হরিলুট', 'শ্যাওড়াগাছের কাওয়া', 'শত্তুরের মুখে ছাই', 'চোখের মাথা', 'তেলে মরা বাতি'—এমনি অজস্র গভীর অর্থবহ শব্দবন্ধ বা বাগধারা লেখক ব্যবহার করেছেন নিজস্ব বর্ণনায় এবং চরিত্রের সংলাপ-সৃষ্টিতে। যাপিত লোকজীবনের বা লোকায়ত মনীষার সফল প্রতিফলনে এ উপন্যাসে সমাজতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের উজ্জ্বল জাগরণ ঘটেছে এ ধরনের ভাষা-ব্যবহারে।

গ্রাম্য-সমাজে ঠাট্টা-মস্করা বা শ্লোক ভাঙ্গানো বা ধাঁধা – যথেষ্ট কৌতূহলের জাগরুক। রহস্য-রসিকতার প্রধান অবলম্বন এই শ্লোক; এটি যারা বাঁধতে পারে বা অর্থ নির্মাণে দক্ষ—তাদের প্রায়ই ডাক পড়ে বিয়ে-বাড়ির মজলিশে নতুন জামাইকে পরীক্ষা বা জব্দ করতে। এদের বলে 'জামাই-ঠকানি'। এ উপন্যাসে উদয়তারাকে এই অভিধায় অভিহিত করা হয়। উদয়তারা মুহূর্তের মধ্যে মুখে মুখে ছড়া কাটতে পারে, শ্লোক তৈরি করে প্রতিপক্ষকে বিভ্রান্ত করতে পারে। তার শ্লোকের অর্থ অবশ্য খুব সহজেই সামধান করে দেয় তার দুই সহোদর বোন—নয়নতারা ও আসমান তারা। সমস্ত রাত পিঠা বানাবার জন্য জেগে থাকার প্রয়োজনেও এই তিন বোন আশ্রয় নেয় শ্লোকের; একের পর এক শ্লোকের চর্চা করে নিজেদের শরীর ও মনকে রাখে সতেজ, সজাগ।

উদয়তারা উচ্চারিত কিছু শ্লোক ও তার 'মান্তি' বা অর্থ উল্লেখ করা হল –

১. সু-ফুল ছিট্যা রইছে, তুলবার লোক নাই
সু-শয্যা পইড়া রইছে, শুইবার লোক নাই (বর্মণ, ২০০০ : ৫০৪);
২. হিজল গাছে বিজল ধরে, সন্ধ্যা হইলে ভাইঙ্গা পড়ে (বর্মণ, ২০০০ : ৫০৮);
৩. পানির তলে বিন্দাজী গাছ ঝিকিমিকি করে,
ইলসা মাছে ঠোকর দিলে ঝরঝরাইয়া পড়ে (বর্মণ, ২০০০ : ৫০৮);
৪. আদা চাক্‌চাক্ দুধের বর্ণ, এ শিলোক না ভাঙ্গাইলে বৃথা জন্ম (বর্মণ, ২০০০ : ৫০৮);

উল্লিখিত ১ নং শ্লোকের প্রথম অংশে আকাশ ও দ্বিতীয় অংশে নদী বোঝানো হয়েছে; ফুল ফুটে আছে মানে – তারা ফুটে আছে এবং শয্যা বলতে জলের সমতলতা বা প্রবহমানতাকে প্রতীকায়িত করা হয়েছে। ২নং শ্লোকের অর্থ-হাট, ৩নং-এর অর্থ কুয়াশা এবং ৪নং শ্লোকে টাকাকে বোঝানো হয়েছে।

তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসের মহায়তন কলেবরে স্থান পেয়েছে বহু আঞ্চলিক শব্দ বা রূপমূল। নদী, মালো ও কৃষিজীবী জীবন ও পেশাগত বিবরণে ঔপন্যাসিক নিজে এসব শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাকৃতজনের মৌখিক ভাষায় এ ধরনের শব্দের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন অবলীলায়। চৌয়ারি, আলিপনা, জোকার, মুখে-পস্‌সাদ, আলন্তির দিন, জালা-বিয়া প্রভৃতি উৎসব-সংক্রান্ত শব্দ; জিয়লের ক্ষেপ, খলা-বাওয়া, রাতের জাল প্রভৃতি মালোদের পেশা-সংক্রান্ত নিজস্ব পরিভাষা; ডহর, গাঙ,

গলুই, চরকি, তকলি, কাঠা, ডোলা, খেউ দেওয়া প্রভৃতি জীবনযাপনের উপাদান-সংক্রান্ত শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায় এ উপন্যাসে। ব্যবহৃত কিছু আঞ্চলিক শব্দের উল্লেখ করে তাদের অর্থ বা মান ভাষায় ব্যবহৃত রূপ দেয়া হল –

(ক) বিশেষ্য :

আখর – অক্ষর।
আলিপনা – আলপনা।
ইস্তিরি – স্ত্রী।
কাইজ্যা – ঝগড়া।
কাওয়া – কাক।
কুয়ারা – ঠাট্টা।
খলা – মাঠ, এখানে মাঠের মতো বিস্তীর্ণ জলাশয়কে বুঝিয়েছে।
গতর – দেহ।
গাতি – গর্ত।
গোপাট – গরু চলাচলের প্রশস্ত রাস্তা, সড়ক।
ঠার-ঠিসারা – ঠাট্টা, রসিকতা।
ঠেস – নিন্দা জ্ঞাপন।
ডহর – মাছ ধরার ফাঁদ।
তরাগ – দীঘি।
পরস্তাব – প্রস্তাব, কাহিনি।
পুত – পুত্র।
পুলা – ছেলে।
মাথট – মাথা পিছু ধার্য করা চাঁদা বা কর।
মেন্নত – মেহনত।
সফরকন্দ – মিষ্টি আলু।
সাউকারি – মহাজনি।
লখ – সঙ্গী, সাথী।
হিমাইল – হিমালয়।

(খ) বিশেষণ :

অখন – এখন।
আরব্বা – উৎসব।
হ্যাঙ্গরতলা – পায়ের নিচে।
কাটাল – সময়।
ডিগা –অপক্ব।

ঢঙ্গী – ঢঙ করে যে।
ততা – গরম।
নিশত্তুরী – যে নারীর শত্রু নেই।
বেবাক – সব।
মাইট্যা – মেটে।
রাঁড়ি – বিধবা।

(গ) ক্রিয়া :

আইক্যা – এঁকে।
আই – আসি।
আজনাইবে – অপমান করবে।
উজাগর – জেগে থাকা, না ঘুমানো।
উদার্চন – উচ্চারণ, উত্থাপন।
খলা বাওয়া – খলা বা নির্দিষ্ট জলাশয়ে মাছ ধরে বাড়তি জীবিকার্জন।
চুইক্যা গেছে – শেষ হয়ে গেছে।
জিয়াইয়া – জীবিত রেখে।
ডরাই – ভয় পাই।
ঢাইল্যা – ঢেলে।
পারবায় না – পারবে না।
বেসাত – বিক্রয়যোগ্য জিনিস।
মুলামুলি – দামাদামি করা।
রাইখ্যা – রেখে।
শুইন্যা – শুনে।
সির্জন – সৃজন।

(ঘ) সর্বনাম :

ইটা – এটা।
কেডা – কে।
তোমরার – তোমাদের।
আমরার – আমাদের।
তারার – তাদের।
তান্‌রা – তাঁরা।

(ঙ) অব্যয়ঃ

লাগি – জন্য।
কেনে – কেন।

কিছু সম্বোধনবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে; যেমন – বা'জি (বাবা), হউর(শ্বশুর), কি লো (সম্বোধন), জাল্লা (জেলে) ইত্যাদি। উপন্যাসে ব্যবহৃত শব্দাবলির উল্লিখিত সামান্য নমুনার মধ্যেও ত্রিপুরার উপভাষার চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। সর্বনাম পদে 'এটা' হয় 'ইটা' – অর্থাৎ শব্দের আদিস্থানে স্বরধ্বনির বৈপরীত্য ঘটেছে; ঠিক তেমনি শব্দের মধ্যাবস্থানে বৈপরীত্য ঘটেছে 'কে' স্থলে 'কেডা(ক্যাডা)' উচ্চারিত হওয়ায় – এগুলো কুমিল্লার উপভাষার সাধারণ বৈশিষ্ট্য (মনিরুজ্জামান, ১৯৯৪ : ২৬২)। তাছাড়া উপন্যাসের স্থানিক পটভূমি স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে একাধিক স্থানে। কন্যার বাবার কাছে পরিচয়ের পূর্ণাঙ্গতা প্রদানে কিশোর তাঁর যে ঠিকানা দিয়েছে, তাতে জিলা-ত্রিপুরা বলে উল্লেখ করেছে (বর্মণ, ২০০০ : পৃ. ৪৩৫)।

২.২

কথাসাহিত্যিক আবু ইসহাকের *পদ্মার পলিদ্বীপ*-এ নির্মিত হয়েছে চরের বিরূপ প্রতিবেশে দ্বন্দ্বমুখর সংগ্রামী-জীবনের আলেখ্য। পদ্মার পলিবাহিত দ্বীপ বা চরে ভাঙ্গা-গড়ার দোলাচলে সংগ্রামশীল মানুষের জীবনাকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে এ উপন্যাসের কাহিনি-কাঠামোতে। দুর্দমনীয় পদ্মা প্রতিনিয়ত গ্রাস করে চলেছে তার তীরবর্তী ভূমিকে। এই ভূমি-ভাঙ্গা-পলল কালের প্রবাহে সঞ্চিত হয়ে পদ্মার বুকে নতুন চরের সৃষ্টি করেছে আবার তা ভেঙ্গেও যাচ্ছে। ভূমি-কেন্দ্রিক পূর্ববাংলার জন-জীবনে পদ্মার চরের ভাঙ্গন-গড়ন যে স্বপ্ন এবং স্বপ্ন-ভঙ্গের বেদনা সৃষ্টি করেছে ঔপন্যাসিক তা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় ধারণ করে শিল্পে প্রয়োগ করেছেন। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, আবু ইসহাকের জন্ম ফরিদপুর জেলায় (বর্তমানে শরীয়তপুর) এবং পদ্মার ভাঙ্গা-গড়ার খেলা বৃহত্তর ফরিদপুর জেলায় দীর্ঘকাল ধরে (এমনকি বর্তমানেও) ক্রিয়াশীল। ফরিদপুরের অধিকাংশ ভূমিই পদ্মানদী-জাত চর। এ অঞ্চলে চর ও মূলভূমির মানুষের মধ্যকার জীবন-যাপন বা সামাজিক কৌলিন্যের পার্থক্য এখনও সম্পূর্ণ বিলীন হয়ে যায়নি। ঔপন্যাসিক আশৈশব চর-ভাঙ্গা ভূমিহীন মানুষ, তাদের বাঁচার সংগ্রাম, নতুন চর জাগলে তা দখলের উন্মাদনা প্রভৃতি ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন খুব কাছ থেকে এবং অসাধারণ শৈলী ও বিন্যাসে গ্রথিত করেছেন এ উপন্যাসে।

পদ্মার পলিদ্বীপ একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের জন-জীবনের শিল্প-ভাষ্য। এ কারণে উপন্যাসটিকে আঞ্চলিক উপন্যাস বা Regional Novel হিসেবে অভিহিত করা হয়। *পদ্মার পলিদ্বীপ* উপন্যাসের ভাষা-নির্মাণে ঔপন্যাসিক জীবন-বিচ্ছিন্ন নন বরং জীবন সম্পৃক্ত করার প্রয়াসেই আঞ্চলিক ভাষারীতি অনুসারী। উপন্যাসে মূলত বর্ণনারীতিতে চলিত ভাষার ব্যবহার করা হয়েছে। তবে ঔপন্যাসিকের পরিশীলিত বর্ণনায় চলিত রীতির সঙ্গে সঙ্গে কখনও কখনও আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহৃত হয়ে নতুন ভাষা-চরিত্র গঠন করেছে। যেমন –

> মতির হাতে বৈঠা দেয়ার আর এক উদ্দেশ্য ছিল ফজলের। সে মাঝির কাঁথার গাঁটরি তন্নতন্ন করে খোঁজে। চোঙাচুঙি উপুর করে ঢেলে দেখে, হাতিয়ে দেখে নৌকার ডাওর (ইসহাক, ২০০০ : পৃ. ১২৬)।

মার্জিত চলিত রীতির সঙ্গে গাঁটরি, চোঙা-চুঙি, ডাওর প্রভৃতি আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহারে ঔপন্যাসিক ভাষার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য নির্মাণ করেছেন। এ উপন্যাসের ভাষা-নির্মাণে আবু ইসহাক মূলত মুন্সীগঞ্জ ও ফরিদপুর জেলার আঞ্চলিক ভাষাবৈশিষ্ট্যের অনুসারী (শামীম, ২০০২ : ৩৭)। নিজ অঞ্চলের ভাষা ব্যবহারে তিনি অত্যন্ত দক্ষ ও সাবলীল। উপন্যাসের সংলাপ নির্মাণে তিনি পুরোপুরি আঞ্চলিক ভাষা-রীতির অনুসারী। যেমন –

> মেহের মুনশি বলে, 'আস্তে আস্তে চালাও। আন্ধার অউক।'
>
> 'চইল্যাতো গেছে। আবার আস্তে আস্তে ক্যান?' মেঘু পালোয়ান বলে। 'দুফরের খাওনডা মাইর গেছে। জলদি চালাও।'
>
> 'হ জলদি চালাও।' আলেফ সরদার বলে। 'প্যাট্টার মইদ্যে শোল মাছের পোনা কিলবিলাইতে আছে।'
>
> (ইসহাক, ২০০০ : ৮৯)।

প্রবাদ-প্রবচনের প্রভূত শিল্পসম্মত ব্যবহার এ উপন্যাসের ভাষা-বৈশিষ্ট্যকে সমৃদ্ধ করেছে। লোকায়ত মনীষাজাত প্রবাদ-প্রবচনের প্রয়োগে চরাঞ্চলীয় মানুষের জীবনের চিত্রায়ন সজীব অভিব্যক্তি পেয়েছে। এ উপন্যাসে ব্যবহৃত কিছু প্রবাদ-প্রবচন –

১. পক্ষীর গুড়া আর মাছের বুড়া, খায় রাজা আটকুড়া (ইসহাক, ২০০০ : পৃ. ১৬);
২. চরের বাড়ি মাটির হাঁড়ি, আয়ু তার দিন চারি (ইসহাক, ২০০০ : পৃ. ১৬);
৩. মা মরলে বাপ অয় তালুই (ইসহাক, ২০০০ : পৃ. ৩৪);
৪. লাডি যার মাডি তার (ইসহাক, ২০০০ : পৃ. ৩৯);
৫. যত কাডি সুতা সব নেয় বামুনের পৈতা (ইসহাক, ২০০০ : পৃ. ৪৭);
৬. বাপ-বয়সে ঘোড়া না, লেজেতে লাগাম (ইসহাক, ২০০০ : পৃ. ৮১);
৭. ধান বোনে হাইল্যা, প্যাট ভরে বাইল্যা (ইসহাক, ২০০০ : পৃ. ৯১);
৮. সুইয়া রুই, বইস্যা কই, ক্যাদা ঘাইট্যা ভ্যাদা (ইসহাক, ২০০০ : পৃ. ৯৪);
৯. চাউলে পাতিলে তল(ইসহাক, ২০০০ : পৃ. ৯৮);
১০. লাথির ঢেঁকি আঙুলের টোকায় ওড়ব না (ইসহাক, ২০০০ : পৃ. ১০৩);
১১. বউ আনো ঘর দেখে, মেয়ে দাও বর দেখে (ইসহাক, ২০০০ : পৃ. ১১০);
১২. তৈয়ার লোটে চিড়া কোটা (ইসহাক, ২০০০ : পৃ. ১১০);
১৩. জোর যার চর তার (ইসহাক, ২০০০ : পৃ. ১৬৮);
১৪. মারি অরি পারি যে কৌশলে (ইসহাক, ২০০০ : পৃ. ১৮৩);
১৫. সাচ্চা গুড় আন্ধার রাইতেও মিডা (ইসহাক, ২০০০ : পৃ. ১৯১)

পুথিগত বিদ্যার চর্চা অপ্রতুল হলেও লোকায়ত অধিগত বিদ্যায় শিক্ষিত গ্রামীণ-মানুষ। প্রবাদ-প্রবচনের মৌখিক চর্চার মধ্য দিয়ে তারা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে হস্তান্তরিত করে তাদের সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার। প্রত্যেক অঞ্চলে কিছু প্রবচন থাকে নিজস্ব, আবার

আবহমানকালের গ্রাম-বাংলায় প্রচলিত প্রবচনগুচ্ছ অঞ্চলভেদে কেবল শাব্দিক কিছু পরিবর্তনে পরিবর্তিত হয়ে অঞ্চলের নিজস্ব আবহাওয়ায় জারিত হয়। যেমন – 'জোর যার মুল্লুক তার' এ প্রবচনটি চরাঞ্চলে হয়েছে – 'জোর যার চর তার'। নদীকেন্দ্রিক জীবনে মৎস্য জীবিকার্জনের না হলেও জীবনের অংশ। তাই মাছের চারিত্র- বৈশিষ্ট্য মানুষের উপর আরোপ করে নির্মিত হয়েছে 'সুইয়া রুই, বইস্যা কই, ক্যাদা ঘাইট্যা ভ্যাদা' এই প্রবচনটি।

কোন অঞ্চলের উপভাষায় সে অঞ্চলের মানুষের 'পেশাগত বৃত্তিমূলক রূপমূল' (মোরশেদ, ১৯৯৭ : পৃ. ১৬৪) বিশেষ স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী। এ উপন্যাসে শ্রমজীবী মানুষের জীবনযাত্রার অনুপুঙ্খ বিবরণে ঔপন্যাসিক তাদের পেশা সংক্রান্ত বিভিন্ন উপকরণ উল্লেখ করেছেন; মাছ ধরার নানা সরঞ্জাম - চাই, দোয়াইর, খাদইন, পারন, ঝাঁকিজাল, ধর্মজাল, ইলশাজাল, মইজাল, লেদ বড়শি, ঘাইল প্রভৃতি উল্লেখ যেমন এই উপন্যাসে আছে, তেমনি নদীকেন্দ্রিক মানুষের যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম নানান ধরনের নৌকা, ঘাসি নৌকা, পানসি, ডিঙি, গস্তি নৌকা, নিকারি-নৌকা প্রভৃতির নাম জনজীবনের বাস্তবতাকে রূপদান করেছে।

পদ্মার পলিদ্বীপ উপন্যাসে আবু ইসহাক প্রচুর আঞ্চলিক শব্দ বা রূপমূল ব্যবহার করেছেন বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া, ক্রিয়া-বিশেষণ, সর্বনাম – সব ধরনের পদে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র 'বাংলাদেশের আঞ্চলিক অভিধান'-এর সাহায্য নিয়ে বলা যায় এ উপন্যাসে ব্যবহৃত প্রায় সব শব্দই ফরিদপুর ও বৃহত্তর ঢাকা অঞ্চলের উপভাষাভুক্ত। বেশ কিছু শব্দ অবশ্য ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র অভিধানে পাওয়া যায় না। যেমন – দুদু(চাচা), ছনিবনি (ছটফট), আন্ডা বিরান (ভাজা ডিম) ইত্যাদি। আবু ইসহাক এ উপন্যাসের পরিশিষ্টে ৬৫০-এর বেশি শব্দের পরিচিতি দিয়েছেন; অর্থাৎ শব্দের অর্থ, শব্দের উৎস বা প্রকরণ ইত্যাদি বর্ণনাক্রমিক সাজিয়েছেন। ঔপন্যাসিক নিজে একজন অভিধান-প্রণেতা[২] বলে পাঠকের সুবিধার্থে আভিধানিক বিন্যাসে উপন্যাসে ব্যবহৃত উপভাষার রূপমূলগুলো নির্দেশ করেছেন এবং মান ভাষা অনুযায়ী তার অর্থ বা প্রতিশব্দ নির্ধারণ করেছেন।

উপন্যাসে ব্যবহৃত কিছু রূপমূলের পরিচয় দেয়া গেল –

(ক) বিশেষ্য :

অদিষ্ট – অদৃষ্ট।
আইক্কা – বাঁশ থেকে কঞ্চি কেটে ফেলার পর কঞ্চির গোড়ার যে অংশ বাঁশের পিঠের সাথে থেকে যায়।
আহেক্কাত – আকাঙ্ক্ষা।
আফার – খড় বা টিনের চালার নিচে তৈরি পাটাতন বা মাচান।
ইসাব – হিসাব।
ইযারি – কাঠের চামচ।

উল্লাগুল্লা – প্রচণ্ডভাবে ওলটানো বা ঘোলানো।
এইহানে – এইখানে/এখানে।
ওচা – বাঁশের চটা দিয়ে তৈরি মাছ ধরার ত্রিভুজাকৃতি ফাঁদ।
ওতঘাত – ওত পেতে আঘাত হানার কায়দা-কৌশল, ফন্দি-ফিকির।
কতা – কথা।
কাইজ্যা – ঝগড়া, মারামারি।
কাঁডা – কাঁটা।
খোন্দল – গর্ত।
খবরিয়া – খবরদাতা।
খুই – খোলস, খোসা।
গাবুর – চাকর, ভৃত্য।
গ্যারাফি – নোঙর।
গ্যান্ডারি – আখ, ইক্ষু।
ঘষনা – যে বাঁশ বা কাঠের সাথে বৈঠা বা দাঁড় ঠেকিয়ে টানা হয়।
চরাট – নৌকার দুই মাথার পাটাতন।
চলপানি – নৌকা চলার মতো গভীর পানি।
চাকইর‍্যা – চাকুরিয়া, ভাড়াটে লাঠিয়াল।
চিবি – চাপ।
চ্যাগাবেগা – কাঁটাযুক্ত চ্যাপ্টা মৎস্যেতর জলজ প্রাণী।
ছাডা ইচা – গলদা চিংড়ি।
ছ্যান – খেজুরগাছ কাটার ধারালো লম্বা দা।
জ'ব – জবাব, জবান, বাকশক্তি।
জাবড়ি – গলার নিচের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পানিতে ডুবিয়ে দেয়া।
জুত – আরাম, সুবিধা, মজা।
ট্যাঁটা – গেঁথে মাছ মারবার বহু শলাকা বিশিষ্ট অস্ত্র যা দাঙ্গায়ও ব্যবহার করা হয়।
টুঙ্গি – উঁচু ছোট ঘর।
ঠাডা – বজ্র।
ডওরা – নৌকার খোলের মধ্যবর্তী স্থান।
ডাওর – একটানা কয়েকদিন ধরে বৃষ্টি।
ঢিপলা – ছিপি, দলামুচড়ি করা যে জিনিস দিয়ে গর্তের মুখ বন্ধ করা যায়।
তোতাশলা ও মুইন্যাশলা – হালের ওপর দিকে মুইন্যাশালা ও তার নিচে উল্টো দিকে তোতাশলা থাকে।
থইলতদার – চোরাই মাল যে গচ্ছিত রাখে।
দাউন – এক ডোরে বা রশিতে পরপর বাঁধা অনেক বড়শি।
দোয়াইর – মাছ ধরবার বাঁশের শলা দিয়ে তৈরি ফাঁদ।
পারন – বাঁশের শলা দিয়ে তৈরি বড় মাছ ধরার ফাঁদ।
পোয়াত্যা তারা – প্রভাতী তারা, শুকতারা।

ফ্যাজাগোজা – রসকষহীন আবর্জনা।
বউকনা – মাটির পাত্র বিশেষ।
বাইছা – মাঝি।
বাইল্যা – বাবুই পাখি।
বৌকা – মাছ রাখার পাত্র।
ভোক্ষস – ভুখা রাক্ষস।
মিয়াজি – শ্বশুর।
মিরদিনা – মেরুদণ্ড।
মেকুর – বিড়াল।
রাব – চিটাগুড়।
লাগুড় – নাগাল।
শাচক – কন্যাপক্ষকে দেয়া বিয়ের পণ।
সর্মান – সম্মান।
হরদারি – সরদারি।
হামতাম – গণ্ডগোল, তাড়াহুড়ো।

(খ) বিশেষণ :

আউত্যা – হাতুয়া, পূর্বের স্বামীর ঔরসজাত যে পুত্র বা কন্যাকে হাতে করে কোনো বিধবা বা পরিত্যাক্তা স্ত্রী পুনরায় বিয়ে করে নতুন স্বামীর বাড়ি যায়।
আজার – হাজার।
আনদুরা-বানদুরা – আঁধার কালো ও বাঁদরমুখো।
এডুক – এইটুকু।
খাডো – খাটো।
জারাজারা – জর্জরিত।
ডফল – ডবল, দ্বিগুণ।
ঢেমনি – উপপত্নী, ব্যাভিচারিণী।
মাগনা – বিনামূল্যে।
লম্ফা – লম্বা।
শুর্দু – শুদ্ধ।
হমান – সমান।
হাপন – আপন।

(গ) ক্রিয়া :

অও – হও।
আইছি – এসেছি।
আইট্যা – হেঁটে।
উডুক – উঠুক।
ক' – বল, বলে ফেল।

কাইট্যা – কেটে।
কিনুম – কিনব।
খাড়ইয়া – দাঁড়িয়ে।
গিল্যা – গিলে।
চইল্যা – চলে।
ছটকাছটকি – লাফালাফি করে ছিটকে পড়া।
ছ্যাবড়া – হঠাৎ ভয়ে চমকানো বা শিউরানো।
টাইন্যা – টেনে।
ঠেইল্যা – ঠেলে।
ডিলিক – আনন্দের আতিশয্যে ডিংগি অর্থাৎ পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়ানো।
থুইয়া – রেখে।
দিমু – দেব।
দ্যাহাইয়া – দেখিয়ে।
ধুইন্যা – ধুনে, ভর্ৎসনা করে তুলোর মত ছিন্নভিন্ন করে।
নাইম্যা – নেমে।
পা'লি – পাইলি, পেলি।
বাইন্দা – বেঁধে।
বোলাইয়া – ডাকিয়া, ডেকে।
হাঁতরাইয়া – সাঁতরাইয়া, সাঁতরে।
হিগলে – শিখলে।
হুতি দিয়া – মাথা নিচু করে লুকিয়ে।
হুনা – শোনা।

(ঘ) ক্রিয়া-বিশেষণ :

অমুন – এমন।
এম্বায় – এমনভাবে, এমনিভাবে।
এহন – এখন।
চিলসত্বর – চিলের ছোঁ মারার মত তাড়াতাড়ি।
দিঘে-পাশে – দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে।
পাতালি – আড়াআড়ি।
পুনুপুনু – আস্তে আস্তে।
বাইতা বাইতা – বমি বমি ভাব।
মইদ্যে – মধ্যে।
যেমবায় – যেমনভাবে।
হবিরে – সকালে, তাড়াতাড়ি।
হেমবায় – সেভাবে।
হেষে – শেষে।

(ঙ) সর্বনাম :

এইডার – এটার
ওনরা – ওনারা, তাঁরা।
ক্যাডা – কে ওটা?

(চ) অব্যয় :

আইচ্ছা – আচ্ছা, বেশ।
আইজ – আজ।
কুনখানে – কোথায়।
কুন্তু – কিন্তু।
ক্যাঁ, ক্যান – কেন।
ক্যামনে – কেমনে।
ছনিবনি – ছটফট।
তন – হইতে, থেকে।
থিকা – হইতে, থেকে।
লগে – সঙ্গে, সাথে।
লেইগ্যা – লাগিয়া, লেগে।

উপর্যুক্ত শব্দগুলো দেখে এ সিদ্ধান্তে সহজেই আসা যায় যে, *পদ্মার পলিদ্বীপ* উপন্যাসে ব্যবহৃত আঞ্চলিক ভাষা বা বৃহত্তর ফরিদপুরের উপভাষার সঙ্গে চলিত ভাষার পার্থক্য প্রধানত বিশেষ্য পদগুলোতে। অন্যান্য পদেও ধ্বনি পরিবর্তন বা প্রতিস্থাপনের কিছু বিষয় পরিলক্ষিত হয়। সব মিলিয়ে এটি যে, ফরিদপুর অঞ্চলের ভাষা, তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না। উপন্যাসেও অঞ্চলের স্থানিক পটভূমির পরিচয় স্পষ্ট করা হয়েছে – "'আমরা ঢাকা-ফরিদপুরের দাওয়ালরা যদি না যাই তয়তো ভাটি আর উজান মুল্লুকের খেতের ধান খেতেই নষ্ট অইব।' বলে আহাদালী" (ইসহাক, ২০০০ : পৃ. ১৬৩)।

৩. ১

তিতাস একটি নদীর নাম ও *পদ্মার পলিদ্বীপ* উপন্যাসদ্বয়ে নদীকেন্দ্রিক জনজীবন ও অন্ত্যজ জীবনের রূপায়ণে মূলত পূর্ববঙ্গীয় উপভাষা ব্যবহৃত হয়েছে। স্থানিক পার্থক্য থাকলেও একই ভাষাগোত্রের হওয়ায় উভয় উপভাষার রূপমূল ও ধ্বনিগত সাম্য দেখা যায় এবং একই সঙ্গে পার্থক্য বা স্বাতন্ত্র্যও চিহ্নিত করা যায়।

অবস্থানগত সীমাবদ্ধতা এবং স্বরসঙ্গতির কারণে /এ/ ধ্বনির বহুল পরিবর্তন 'পূর্ব বাংলার' ভাষার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য (মনিরুজ্জামান, ১৯৯৪ : ২৬৩)। বিবর্তন সাপেক্ষতার কারণে এ > এ্যা এবং এ্যা > এ অবস্থার উদ্ভব আলোচ্য উভয় উপভাষাতে দেখা যায়। যেমন: কে > ক্যাডা দুটি উপন্যাসেই পাওয়া যায়। আবার তিতাস পাড়ে কেন > কেনে কিন্তু পদ্মা পাড়ে কেন > ক্যান্ হয়ে যাচ্ছে। উভয় উপভাষাকে এ্যা ধ্বনি ব্যবহারে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য – দুই-ই দেখা যায়।

অপনিহিতির যে বৈশিষ্ট্য পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার একটি বৈশিষ্ট্য তাও উভয় উপন্যাসেই রয়েছে। আজি বা আজ > আইজ, রাখিয়া/রেখে > রাইখ্যা, দেখিয়া/ দেখে > দেইখ্যা – এ ধরনের পরিবর্তিত ধ্বনি উভয় উপন্যাসের ভাষিক অবয়বের এক বিরাট অংশ জুড়ে আছে।

সর্বনাম পদের রূপমূলের তারতম্য অবশ্য দেখা যায় উপন্যাসদ্বয়ে। *তিতাস একটি নদীর নাম* উপন্যাসে আমাদের > আমরার, তোমাদের > তোমরার, তাঁর > তানার পাওয়া যায়; *পদ্মার পলিদ্বীপ* উপন্যাসে আমাদের >আমাগো, তোমাদের > তোমাগো, তাঁর > তেনার/ত্যানার এভাবে দেখা যায়।

গ্রীয়ার্সন ত্রিপুরার উপভাষার বৈশিষ্ট্য হিসেবে হ-ধ্বনির অন-বা হ্রস্ব উচ্চারিতার কথা বলেছেন (মনিরুজ্জামান, ১৯৯৪ : ২৬৩)। আলোচ্য উভয় উপন্যাসের ভাষায় এ বৈশিষ্ট্য প্রযুক্ত হয়েছে, যেমন: হইয়া/হয়ে > অইয়া এ ধরনের পরিবর্তন দেখা যায়। "বার অইয়া দেখ না" (বর্মণ, ২০০০ : পৃ.৪১৯); "ইস্কুলে যাইতে অইব কিন্তু" (ইসহাক, ২০০০ : পৃ.২০)। আবার শ-ধ্বনিকে হ দিয়ে প্রতিস্থাপনের কারণে উভয় উপন্যাসে দেখা যায়, শোনা > হুনা, শুকনা > হুগনা, সকল > হগল । দ্বিতীয় ও তৃতীয় উদাহরণে কেবল প্রতিস্থাপন ঘটেনি, সেই সঙ্গে অঘোষ ধ্বনি > ঘোষ ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে।

৩.২

যেকোনো উপভাষার সঙ্গে মানভাষার উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বোঝা যায় বাক্যের মাধ্যমে। বাক্যের গঠন, পদবিন্যাস, নিজস্ব শব্দসম্ভারের যথোপযুক্ত ব্যবহারে বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষার অবয়ব গড়ে ওঠে; এক অঞ্চলের ভাষার সঙ্গে অন্য অঞ্চলের সঙ্গে পার্থক্য তৈরি হয়। মানভাষার সঙ্গে উপভাষার তুলনামূলক আলোচনায় উপভাষার স্বাতন্ত্র্য বা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করা যায়। আলোচ্য দুই উপন্যাসেই চরিত্রমুখে বা সংলাপে উপভাষার ব্যবহার দেখা যায়।

তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসে ব্যবহৃত ত্রিপুরা বা কুমিল্লা অঞ্চলের উপভাষা ও মানভাষার তুলনামূলক উপস্থাপন দেওয়া হল –

	***তিতাস একটি নদীর নাম* উপন্যাসে ব্যবহৃত বাক্য**	**মানভাষায় ব্যবহৃত বাক্য**
১.	'উঠানজোড়া আলিপনা আকমু : (বর্মণ, ২০০০ : পৃ. ৪১৪)	উঠানজোড়া আলপনা আঁকব।
২.	'এই জাগাত্ই রাইত্ থাইক্যা যাইরে সুবলা।' (বর্মণ, ২০০০ : পৃ. ৪১৭)	এই জায়গায় রাতে থেকে যাই, সুবল।

৩.	'ইখানে পাড়া দে।' (বর্মণ, ২০০০ : পৃ. ৪১৯)	এখানে পা দে/ ফেল।
৪.	'ইখানে থাকলেই সার্‌ব? ত'র বাড়িতে দশজনের কি জন্য ডাকাইলে ক।' (বর্মণ, ২০০০ : পৃ. ৪৫১)	এখানে থাকলে চলবে? তোর বাড়িতে দশজনকে কি জন্য ডাকালে বল।

উপর্যুক্ত উদাহরণ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, *তিতাস একটি নদীর নাম* উপন্যাসে ব্যবহৃত ত্রিপুরা বা কুমিল্লার উপভাষা ও মানভাষার বাক্যে গঠনগত বা পদবিন্যাসগত কোনো তারতম্য নেই, পার্থক্য কেবল ব্যবহৃত শব্দ বা রূপমূলে।

পদ্মার পলিদ্বীপ উপন্যাসে ব্যবহৃত ফরিদপুর অঞ্চলের উপভাষার বাক্য ও মানভাষার বাক্যের বেলাতেও একই কথা প্রযোজ্য হবে; কেননা এ অঞ্চলের ভাষাতেও বাক্যের পদবিন্যাস ও গঠন মোটামুটি মানভাষার অনুরূপ।

উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি স্পষ্ট করা যায় –

	***পদ্মার পলিদ্বীপ* উপন্যাসে ব্যবহৃত বাক্য**	**মানভাষার বাক্য**
১.	'আমি এডুক শেষ কইর‍্যা আইতে আছি।' (ইসহাক, ২০০০ : পৃ. ১৫)	আমি এটুকু শেষ করে আসছি।
২.	'ও দুদু, দাদি তোমারে বোলায়।' (ইসহাক, ২০০০ : পৃ. ৩১)	ও চাচা/কাকা, দাদি তোমাকে ডাকে।
৩.	'পা-না-ধোয়া জঙ্গুরুল্লা বড় বাইড়্যা গেছিল।	পা-না-ধোয়া জঙ্গুরুল্লা বড় বেড়ে গিয়েছিল।
	মানুষেরে মানুষ বুইল্লা গিয়ান করে নাই।	মানুষকে মানুষ বলে জ্ঞান করেনি।
	এইবার ফজল মিয়া ওর মিরদানা ভাইঙ্গা দিছে।	এবার ফজল মিয়া ওর মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছে।
	(ইসহাক, ২০০০ : পৃ. ২১১)	

উপর্যুক্ত উদাহরণের প্রথম বাক্যে 'আইতে আছি' শব্দদ্বয়ের বিপরীতে মানভাষায় একটি শব্দ 'আসছি' ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু পদক্রমে কোনো পরিবর্তন নেই। অন্য উদাহরণগুলোতে পদক্রম বা শব্দসংখ্যারও কোনো পরিবর্তন হয়নি, কেবল শব্দ বা রূপমূলের পরিবর্তন হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার সঙ্গে মানভাষার বাক্যগত তেমন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না; দাক্ষিণাঞ্চলীয় অর্থাৎ চট্টগ্রাম, নোয়াখালীর উপভাষায় যেমন ব্যাপক পার্থক্য দেখা যায়। সেকারণে আলোচ্য নিবন্ধে পূর্ববঙ্গীয় উপভাষার শব্দ বা রূপমূলকেই আলোচনার কেন্দ্রে রাখা হয়েছে, বাক্যগত বিশ্লেষণের আবশ্যিকতা দেখানো হয়নি।

৩.৩

জল ও জীবনের অন্বয়ে রচিত বক্ষ্যমাণ উপন্যাসদ্বয়ে নদী-নির্ভর মানুষের জীবন ভিন্ন মাত্রায় উদ্ভাসিত হয়েছে আঞ্চলিক বা উপভাষার বহুল উপস্থাপনে। তিতাস-তীরবর্তী জনজীবনে ত্রিপুরা বা কুমিল্লার উপভাষার সঙ্গে অদ্বৈত মল্লবর্মণ সাধু ভাষার চরম বৈপরীত্যকে পরম কুশলতার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন তাঁর উপন্যাসে। কলকাতার নাগরিক মানুষের কাছে আঞ্চলিক প্রাকৃত জনজীবনকে মহিমান্বিত এবং ভাবগম্ভীর করে উপস্থাপনের প্রয়াসে হয়তো এ ধরনের ভাষারীতির অবতারণা। তবে কেবল জনজীবন নয়, আঞ্চলিক ভাষাকেও তিনি বিশেষ মর্যাদায় উন্নীত করেছেন উপন্যাসের কলেবরে নিপুণভাবে সংস্থাপন করে। মান ভাষার সঙ্গে উপভাষার সম্বন্বয়ে *তিতাস একটি নদীর নাম* উপন্যাসটি মালো জীবনের মহাকাব্যে পরিণত হয়েছে। *পদ্মার পলিদ্বীপ-এর* চরাঞ্চলীয় লোকায়ত জীবন উপভাষার বহুল প্রয়োগে উপভোগ্য এবং শিল্পসাফল্য পেয়েছে। উভয় উপন্যাসেই বর্ণিত জীবনকে বাস্তবতার শক্তভূমিকে স্থিত করার প্রয়োজনে উপভাষার ব্যবহার সফল ও বাস্তবানুগ। এ উপন্যাসদ্বয়ে ব্যবহৃত পূর্ববঙ্গীয় উপভাষা বাংলা ভাষার বৈচিত্র্যময় ভুবনকে আলোকোজ্জ্বল মহিমায় দীপ্ত করেছে।

টীকা :

১. উপভাষা বিষয়ে গ্রীয়ার্সনের প্রস্তাবিত পদ্ধতি অনুসারে আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ ও রফিকুল ইসলাম বাংলাদেশের উপভাষাগুলোকে যে চারটি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন, তাতে তৃতীয় শ্রেণি বা শাখা পূর্ববঙ্গীয় উপভাষা। আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ এ শাখাটিকে আবার দুটি স্তরে বিভক্ত করেছেন–

(ক) ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, বরিশাল ও সিলেটের উপভাষা;

(খ) ফরিদপুর, যশোর ও খুলনার উপভাষা ; (মোরশেদ, ১৯৯৭ : পৃ.১৩৮)
রফিকুল ইসলাম এ শাখাটিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন –

(ক) ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, বরিশাল

(খ) ফরিদপুর, যশোহর, খুলনা

(গ) সিলেট

আলোচ্য রচনায় ত্রিপুরা বা কুমিল্লার এবং ফরিদপুরের উপভাষা আলোচিত অর্থাৎ উভয়ই পূর্ববঙ্গীয় উপভাষা গোত্রভুক্ত।

২. কথাসাহিত্যিক আবু ইসহাকের আভিধানিক হিসেবে পরিচিতি আছে। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় ১৯৬২ সাল থেকে বাংলা বিশেষিত শব্দের নমুনা সংগ্রহ শুরু করেন তিনি

এবং তাঁর সংগৃহীত শব্দাবলি নিয়ে ১৯৯৩ ও ১৯৯৮ সালে বাংলা একাডেমি *'সমকালীন বাংলা ভাষার অভিধান'*-এর দুই খণ্ড প্রকাশ করে। পরিকল্পিত এ অভিধানের সংকলন পদ্ধতি আবু ইসহাকের নিজস্ব গবেষণাধর্মী উদ্ভাবন।

তথ্যপঞ্জি

মল্লবর্মণ, অদ্বৈত (অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পাদিত) (২০০০) । *রচনাসমগ্র*। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং

মল্লবর্মণ, অদ্বৈত (বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত) (২০০৮)। *তিতাস একটি নদীর নাম*। ঢাকা : আজকাল প্রকাশনী

ইসহাক, আবু (২০০০)। *পদ্মার পলিদ্বীপ*। ঢাকা : নওরোজ সাহিত্য সম্ভার

মোরশেদ, আবুল কালাম মনজুর (১৯৯৭)। *আধুনিক ভাষাতত্ত্ব*। কলকাতা : নয়া উদ্যোগ

লেখা, ইয়াসমীন আরা (২০১৭)। *ফরিদপুরের উপভাষা: আন্বয়িক গঠন*। ঢাকা : বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

শামীম, গিয়াশ (২০০২)। *বাংলাদেশের আঞ্চলিক উপন্যাস*। ঢাকা : বাংলা একাডেমি

চৌধুরী, তিতাশ (২০০১)। *অদ্বৈত মল্লবর্মণ ও অন্যান্য প্রবন্ধ*। ঢাকা : জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন

ভট্টাচার্য, পরেশচন্দ্র (১৯৯৬)। *ভাষাবিদ্যা পরিচয়*। কলকাতা : জয়দুর্গা লাইব্রেরি

মনিরুজ্জামান (১৯৯৪)। *উপভাষা চর্চার ভূমিকা*। ঢাকা : বাংলা একাডেমি

শহীদুল্লাহ্, মুহম্মদ (সম্পাদিত) (১৯৯৩)। *বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান*। ঢাকা : বাংলা একাডেমি

হাই, মুহম্মদ আবদুল (১৯৯৮)। *ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব*। ঢাকা : মল্লিক ব্রাদার্স

ইসলাম, রফিকুল (১৯৯৭)। *ভাষাতত্ত্ব*। কলকাতা : বুক ভিউ

'শ, রামেশ্বর (১৪০৩)। *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*। কলকাতা : পুস্তক বিপণি

সেন, সুকুমার (১৯৯৪)। *ভাষার ইতিবৃত্ত*। কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি.